তাঁর গান : আমার কাছে

সন্‌জীদা খাতুন

তাঁর গান : আমার কাছে

মনফকিরা
www.monfakira.com

সন্‌জীদা খাতুন
তাঁর গান : আমার কাছে

ISBN: 978-93-80542-55-3

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৩

প্রকাশক : মনফকিরা
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত, মুকুন্দপুর,
কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায় : ১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন : ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১/ ৯৪৩৩৪-১২৬৮২/ ৯৪৩৩১-২৮৫৫৫
ওয়েবসাইট : www.monfakira.com
ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.fakira@gmail.com/
monfakirabooks@yahoo.co.in
ব্লগস্পট : http://monfakira.blogspot.com
ফেসবুক : https://www.facebook.com/monfakira2013
গুগল প্লাস : https://plus.google.com/u/0/111119619973026469315/posts

মুদ্রক : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

১০০ টাকা

সূ চি

কাব্যগীতি চর্চায় ভাষার ধ্বনি-প্রসঙ্গ ৭
গানের পাঠ আর উচ্চারণ-সমস্যা ১৫
সুর-বাণী-তালের দ্বন্দ্ব-মিলন ২৪
গানের উপলক্ষ ২৯
তাঁর গান : আমার কাছে ৩৪
রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে আলাপ ৪১
ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ৪৬
রবীন্দ্রনাথ : বাংলাদেশের পথের দিশারি ৫৪
রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেম ৬০
রবীন্দ্র-বিশ্বাসে ‘মানব-অভ্যুদয়’ ৬৪
রবীন্দ্রনাথ : বাঙালি মুসলমান সমাজ : বাংলাদেশ ৬৯
জ্ঞানী ভাষাশিল্পী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ৭৭
প্রাবন্ধিক আবদুল হক : সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ ৮২
গণসঙ্গীত : সাধারণ মানুষের গান ৯১

কাব্যগীতি চর্চায় ভাষার ধ্বনি-প্রসঙ্গ

ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক সূক্ষ্ম বোধ সঙ্গীতসাধনার ক্ষেত্রে গুরুত্ববহ। কারণ, ভাষা-ধ্বনির মতো গীতধ্বনিও উচ্চারণ-নির্ভর। বাণী পরিহার করে কেবল স্বর বিস্তার করতে গেলেও স্বরধ্বনির সাহায্য গ্রহণ অনিবার্য হয়। আলাপ বিস্তারের সময়ে শুধু স্বরধ্বনি কেন, কিছু ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণও আবশ্যক হয়, যেমনটি এ-রি-নুম-তে-রি-না ইত্যাদি উচ্চারণে আমরা শুনতে পাই।

বাণীপ্রধান গানের ক্ষেত্রে ভাষাধ্বনির যোগ্য উচ্চারণ গানের সার্বিক নির্বাহণে সহায়ক হয়। বাণীপ্রধান গান, তথা কাব্যসঙ্গীতে বাণীর তাৎপর্যের সঙ্গে সুরছন্দের যোগ নিগূঢ়। বাণী যে-ব্যঞ্জনা বিকশিত করে তুলতে চায়, সুরছন্দও সাধারণত তারই অভিসারী হয়। আবার, সঙ্গীতের যাত্রায় সুর যে-ধ্বনিস্রোতের নকশা বা প্যাটার্ন সৃষ্টি করে, ছন্দ যে-চলনের ভঙ্গি তৈরি করে, তার সঙ্গে মিশে বাণী হয়ে ওঠে ধ্বনিময় অপর উপাদান। সুরের গতিপথে বাণী যেন ছোট-ছোট নুড়ির মতো বেজে উঠতে থাকে। কাব্যগীতি শুনবার সময়ে কথার অর্থের প্রতি মনোযোগী হওয়া স্বাভাবিক। তবে, গান শুনতে-শুনতে বাণীর ধ্বনিসুর আর ছন্দোবিভঙ্গ পরস্পর সম্মিলিত এক ধ্বনিসত্তা হিসেবে শ্রোতার অন্তরে বিভাসিত হয়ে বাণীর অর্থের অতিরিক্ত রসাস্বাদ এনে দেয়। কাব্যগীতি বিশেষ এক মুহূর্তের কোন বোধের চারপাশেই গুঞ্জরণ করে ফেরে। সেই বোধের বিশেষ স্বরটিকে ধরবার জন্যে ভাষাধ্বনির সঙ্গে সুর আর ছন্দের মিলনটি হৃদয়ঙ্গম করা চাই।

কাব্যগীতির আস্বাদনের প্রকার বিষয়ে শ্রোতাদের কাছে প্রশ্ন করলে বিচিত্র জবাব পাওয়া যায়। কেউ হয়তো বাণীর ভাবরসে আপ্লুত, কেউ বা ছন্দে আন্দোলিত, কেউ সুরের রসে বিভোর, আবার কেউ-কেউ একাধিক বিষয়ে সচেতনও বটে। আমরা উত্তম শ্রোতা তাঁকেই বলব, যিনি কাব্যসঙ্গীতের তিন মাত্রা, অর্থাৎ বাণী সুর ছন্দের ঐক্য ধ্যান করে পূর্ণ রসরূপের সমীপবর্তী হন।

এই ধ্যান শ্রোতার কাছে বাণীর বাচ্যার্থ মাত্র প্রতিভাত করে না, কাব্যগীতির ব্যঙ্গ্যার্থ ধ্বনিত করে। এই রকম শ্রবণেই কাব্যসঙ্গীতের মর্ম স্পর্শ করা সম্ভব।

এখন, গায়ক যেহেতু গীতরচয়িতা আর শ্রোতার মধ্যবর্তী সেতু, সেই জন্য গীতশিল্প রূপায়ণে তাঁকে অবশ্যই ধ্বনিসচেতন হতে হবে। সুরের ধ্বনি বিষয়ে যেমন, গানের ধ্বনি বিষয়েও তেমনি। তাই ভাষাধ্বনির বৈশিষ্ট্যচেতনা সঞ্চারণের প্রয়োজনে সঙ্গীতশিক্ষণ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট ভাষার ধ্বনিচরিত্রের সার্বিক পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই জ্ঞান সঙ্গীত পরিবেশনের কালে যথার্থ উচ্চারণ নিষ্পত্তিতে সহায়তা দিয়ে প্রয়োজনীয় অভিব্যক্তি সাধনে গায়কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

বাংলা ভাষার ধ্বনিচরিত্র নিয়ে পূর্ণাঙ্গ চিন্তাভাবনা হয়েছে, বলা কঠিন। আমাদের ভাষাসাহিত্যের বিচিত্র দিকের উদ্বোধক রবীন্দ্রনাথই বাংলা শব্দতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে 'বাংলা উচ্চারণ' (আশ্বিন ১২৯২), 'স্বরবর্ণ অ' (আষাঢ় ১২৯৯), 'স্বরবর্ণ এ' (কার্তিক ১২৯৯), 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ (১৩০৭), 'ভাষার ইঙ্গিত' (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১১) প্রভৃতি প্রবন্ধে ভাষাধ্বনির উচ্চারণ এবং তার নানা তাৎপর্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'বাংলা উচ্চারণ' প্রসঙ্গে তিনি উচ্চারণের কিছু নিয়ম খুঁজে বার করেছিলেন। স্বরধ্বনি বিষয়ের একটি নিয়মের নমুনা— ''ই (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অথবা উ (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) কিংবা ইকারান্ত উকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ 'ও' হইবে; যথা, অগ্নি অগ্রিম কপি তরু অঙ্গুলি অধুনা হনু ইত্যাদি।" (*রবীন্দ্র রচনাবলী* ১০। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার)। ব্যঞ্জনধ্বনির বিন্যাস স্বরধ্বনির উচ্চারণকে যে বিশেষ নিয়মে প্রভাবিত করে, তার একটি নমুনা— ''ক্ষ-র পূর্বে... অ 'ও' হইয়া যায়, যেমন, কক্ষ পক্ষ লক্ষ।" (ঐ)। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রসঙ্গে সামাজিকের চিত্তে ধ্বনির স্বকীয় ভাবের অস্তিত্বের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ''গতির দ্রুততা প্রধানত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়; কিন্তু আমরা বলি ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া, বোঁ করিয়া অথবা ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তীর প্রভৃতি দ্রুতগামী পদার্থ বাতাসে উক্তরূপ ধ্বনি করে, সেই ধ্বনি আশ্রয় করিয়া বাংলা ভাষা চকিতের মধ্যে তীরের উপমা মনে আনয়ন করে। তীরবেগে চলিয়া গেল, বলিলে প্রথমে অর্থবোধ ও পরে কল্পনা উদ্রেক হইতে সময় লাগে; সাঁ শব্দের অর্থের বালাই নাই, সেই জন্য কল্পনাকে সে অব্যবহিতভাবে ঠেলা দিয়া চেতাইয়া তোলে।" (ঐ) স্বরধ্বনির পরিবর্তন তাৎপর্যের যে-বৈষম্য ঘটায়, সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথাও নির্দেশ করেছেন। যেমন— ''যখন বলি, টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তখন এই বুঝায় যে,

ছোটো ফোঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড়ো ফোঁটাটি টাপ করিয়া পড়িতেছ, ঠুকঠাক শব্দের অর্থ একটা শব্দ ছোটো আর একটা বড়ো। উকারে অব্যক্তপ্রায় প্রকাশ, আকারে পরিস্ফুট প্রকাশ।" (ঐ)

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত প্রকারের আলোচনাতে উদ্দীপ্ত হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলাভাষার বর্ণমালা ধরে ধ্বনি এবং তার ব্যঞ্জনার বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর 'শব্দ-কথা' প্রবন্ধ ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা বিষয়ে যুগপৎ চেতনা এবং কৌতূহল উদ্রেক করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিত্তিতে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য যাচাই করে এই বিদ্যার যথোচিত চর্চা শুরু করা প্রয়োজন।

ভাষায় উচ্চারণ বিষয়ে ক্ষমতাধর ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিবিধ আলোচনায় আমরা খণ্ড-ছিন্ন ভাবে কিছু জরুরি প্রসঙ্গের উল্লেখ পাই। বিদেশিদের বাংলা ভাষা শিক্ষার সুবিধার্থে লেখা তাঁর ইংরেজি বইতে বাংলা উচ্চারণ বিষয়ে আমরা নানা মন্তব্য পেয়েছি। সে সব মন্তব্য আমাদের ভাষার উচ্চারণ এবং ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে অনেক ইঙ্গিতপূর্ণ তথ্য ধরে রেখেছে। এই মনীষীর Origin & Development of Bengali Language ছাড়া Bengali Phonetics এবং Bengali Self-taught বই দুটিতেও এই সব তথ্যসূত্র রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা উচিত, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ তাঁর *ভাষা-বোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থের ভূমিকায় দাবি করেছিলেন— বাংলায় স্বরের সহজ, বিকৃত, প্রসারিত ও সংকুচিত উচ্চারণ এই ব্যাকরণেই প্রথম দেখানো হয়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বা বৈয়াকরণ তাঁদের গ্রন্থে উচ্চারণ সংক্রান্ত বিধি আলোচনা করেছেন। তার ভিতরে মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* গ্রন্থটি নানা গুণে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

আমাদের আলোচনার ধারায় বাংলা উচ্চারণ এবং ভাষাধ্বনির চরিত্র— এই দুই প্রসঙ্গ চলে এসেছে। এই দুটি বিষয়ই ভাষার ধ্বনিচর্চার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। উচ্চারণ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গে ধীরানন্দ ঠাকুরের একটি গ্রন্থ ও *আনন্দমেলা* পত্রিকায় কিশোরদের জন্য ছদ্মনামে লেখা ধারাবাহিক একটি আলোচনার কথা জানি। ওপার বাংলার সব গ্রন্থের সন্ধান রাখতে পেরেছি, এমন দাবি করতে পারি না। বাংলাদেশে ঢাকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, জাহানারা ইমাম, মেরী মনোয়ার প্রভৃতি কয়েক জনের উদ্যোগে একটি উচ্চারণের অভিধান প্রকাশিত হয়েছিল। সে পাকিস্তান আমলের কথা। দুই বাংলার দুটি অভিধানেই অনেক সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করা গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর ব্যক্তিগত আগ্রহে হাসি সিদ্দিকী *সুভাষিত সুবচন* নামে উচ্চারণ সংক্রান্ত একটি চটি বই বার করেছিলেন। তাতে উচ্চারণের সার্বিক পর্যালোচনা

হয়নি। ইংরেজি উনিশশো ছিয়াশি সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বাংলা একাডেমী *বাংলা বানান ও উচ্চারণ* নামে জামিল চৌধুরীর লেখা একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বানান ও উচ্চারণ যদিও পরস্পর প্রায় অসম্পৃক্ত ব্যাপার, তবু ঐ গ্রন্থটি সমাদৃত হয়েছে। পরে উল্লিখিত গ্রন্থকারের চেষ্টায় বাংলাদেশ সরকারের গণমাধ্যম ইনস্টিট্যুট থেকে একটি উচ্চারণের অভিধান প্রকাশিত হয়। প্রচার মাধ্যমে ব্যবহৃত শব্দ-তালিকার উপরে ভিত্তি করে অভিধানখানি রচিত হলেও এ গ্রন্থ সাধারণের ব্যবহারযোগ্য একটি ভালো উচ্চারণ অভিধান। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রকাশনা হিসেবে বাংলা একাডেমী অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের তৈরি একটি উচ্চারণ অভিধান ছেপেছেন। গুরুত্বের দিক থেকে এই বইটি উক্ত বিষয়ে এই বাংলায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত সব বইয়ের মধ্যে প্রথম স্থান লাভের যোগ্য। উচ্চারণতত্ত্ব নিয়ে বাংলাদেশের এই সাধনা ও কৌতূহল ভাষাশিক্ষা, সাহিত্যের মর্মোপলব্ধি এবং সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অগ্রযাত্রা। উচ্চারণের সকল প্রশ্নের তর্কাতীত উত্তর পাওয়া যায়নি হয়তো, তবু এই চর্চা সংগঠিত বিদ্যার্জনের প্রয়াস হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

ভাষার ধ্বনিচরিত্র নিয়ে আলঙ্কারিক, সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমালোচকরা নানা সময়ে ভাবনা করেছেন। এই সব আলোচনা ভাষাধ্বনির ব্যঞ্জনাবিচারে আমাদের প্রভূত সহায়তা করে। *কবিতার প্রকৃতি* (১৩৪৮) বইতে নবেন্দু বসু ধ্বনিব্যঞ্জনার ভূমিকা বিশ্লেষণ করে কবিতার রসাস্বাদ করেছেন। সুধীরকুমার দাশগুপ্তের সাহিত্যতত্ত্বের গ্রন্থ *কাব্যালোক*-এ এই প্রসঙ্গ এসেছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *কবিতা-পরিচয়* পত্রিকাতে কবিতার মর্মোদ্ধার করতে গিয়ে অনেকেই ধ্বনির নির্দেশ গ্রাহ্য করেছেন। এঁদের মধ্যে শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, হেমোপম দস্তিদার ইত্যাদির নাম স্মরণ হচ্ছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একাধিক সমালোচনা গ্রন্থে বিভিন্ন স্বরধ্বনি, মহাপ্রাণধ্বনি, রুদ্ধদল ধ্বনি এবং ধ্বনির বিশিষ্ট বিন্যাসের দ্বারা আকৃষ্ট ব্যঞ্জনার গুণ নির্দেশ করেছেন। পূর্বসূরিদের এই সব আলোচনা ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত আমার *ধ্বনি থেকে কবিতা* গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ। সাহিত্যালোচনায় ধ্বনিগুণের উপলব্ধির নিদর্শনগুলো বাংলা কাব্যসঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রেও বিশেষ লক্ষণীয়।

১৯৭৬ সালে *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ* বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সঙ্গীতে ভাষাধ্বনি ব্যবহারের কিছু বৈশিষ্ট্য আমার কানে ধরা দেয়। হিন্দিভাঙা গান 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল' গানটিতে রবীন্দ্রনাথ মূল গানের বাণীর বক্তব্য থেকে সরে এসে ভৈরবী সুরে বিভাসিত ঔদাস্য অনুযায়ী বাণী বিন্যাস করে, ভাষাধ্বনির নিপুণ ব্যবহারে উদ্দিষ্ট ভাবকে ব্যঞ্জিত করেছিলেন। মূল গানের বাণী

ছিল— ''সৈয়াঁ যাও যাও নহি বোলেঙ্গে।/ সগরি রয়ন মোহে তড়পত বীতরে/ না হোত সৈয়াঁ কর যোড়ি/ হট যাও শ্যামবিহারী।/ হেরি তোরি বড়ি দূর।'' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন— ''পিপাসা হায় নাহি মিটিল,/ নাহি মিটিল॥/ গরল রসপানে জরজর পরানে/ মিনতি করি হে করজোড়ে,/ জুড়াও সংসার দাহ তব প্রেমের অমৃতে॥'' বিপ্রলব্ধা নায়িকার বক্তব্য যা-ই হোক, হিন্দি বাণীতে আমরা স (S) শ (Sh) এবং হ এই তিনটি উষ্মধ্বনির ব্যবহার-আধিক্য লক্ষ করি। জানি না, রবীন্দ্রনাথের কানে ভাষাধ্বনি এবং সুরের ব্যঞ্জনাই বড় হয়ে ঠেকেছিল কি না— তাঁর বাণীর বক্তব্য যেন সুরকে অনুসরণ করেই অধ্যাত্মরসপিপাসায় ঊর্ধ্বমুখী হল। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতেও বেশ কয়েকটি উষ্মধনি রয়েছে। পণ্ডিতজনেরা বলেন— উষ্মধ্বনির উচ্চারণে বাতাসের ব্যবহার অধিক বলে বাতাসের হাহাশ্বাসময় উচ্ছ্বাস এই ধ্বনির বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণেও এর সমর্থন পাই, তিনি লিখেছেন— ''হুহু করে বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস'' ('নিরুদ্দেশ যাত্রা')।

গানটির প্রথম ছত্রটি আলোচনা করতে গেলেই ভাষাধ্বনির চরিত্র এর বাণীকে কতখানি ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ করেছে, তা বোঝা যায়। 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল' পঙ্‌ক্তিতে একটি 'স' এবং দুটি 'হ' ধ্বনি আছে। স এবং প্রথম হ-ব্যঞ্জনে আ-স্বরধ্বনি বিন্যস্ত হয়েছে। আ-স্বর উষ্ম ব্যঞ্জন-দুটির হাহাকারকে অবাধে ছড়িয়ে যেতে দিচ্ছে। 'নাহি' পদে হ-এর নির্বাহী স্বরধ্বনি ই-কার। এই প্রবন্ধে এর আগে রবীন্দ্রনাথের মত উদ্ধৃত হয়েছে যে, আ-তে 'পরিস্ফুট' প্রকাশ আর ই-তে 'অব্যক্তপ্রায়' প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতার মূলে পৌঁছুবার জন্য শঙ্খ ঘোষ কবিতাটির প্রথমার্ধের শেষ ছত্র 'মেলে নি উত্তর' আর সবশেষ কলি 'পেল না উত্তর' অংশের ই-কার আর আ-কার ব্যবহারের যোগ্যতা নিয়ে ভেবেছেন।

কবিতাটি শুনে নেওয়া যাক—

'প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি?
মেলে নি উত্তর।

'বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়

কে তুমি?
পেল না উত্তর।'

শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন— ''মেলে নি কথার 'ি' ধ্বনির চাপা টান যেন নিচু করে আমাদের ধরে রেখেছিল ঐহিক ধারণার দিকে, আশা ছিল যে এখনো না মিললেও একদিন জীবনরঙ্গসীমা থেকেই মিলবে বা কোনো উত্তর।" আর তার পরে, 'পেল না উত্তর' প্রসঙ্গে— ''হতাশ নিষ্ফলতার বোধ... 'না' শব্দের প্রসারিত 'আ'-কারে লেগে মুহূর্ত মধ্যে জ্যা-মুক্ত হয়ে নিক্ষিপ্ত হল নিরন্ত শূন্যতার অন্তঃসারে।"

'পিপাসা হায় নাহি মিটিল' বাণীর আ-কার আর ই-কারের তুলনা আরও কিছু দূর যাবে। এখানে আ-কার ই-কার যুক্ত হয়েছে উষ্মধ্বনির সঙ্গে। আ-কারের আলোচনা আগেই হয়েছে, তুলনায় ই-কারের প্রসঙ্গ জটিলতর। 'হি' ধ্বনির পূর্বে লগ্ন রয়েছে আ-স্বরে বাহিত একটি নাসিক্যব্যঞ্জন। নাসিক্যধ্বনি উচ্চারণবৈশিষ্ট্যে পার্শ্ববর্তী ব্যঞ্জন, বিশেষত উষ্মধ্বনির উপরে আপন প্রভাব বিস্তার করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ''আমরা লিখি 'তাঁহারা' কিন্তু উচ্চারণ করি— তাহাঁরা।" ('বাংলা উচ্চারণ', তদেব)। মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন— ''নাসিক্যব্যঞ্জনধ্বনি সংশ্লিষ্ট অক্ষরটির সামগ্রিক উচ্চারণ নাসিক্য-অনুরণনময় তথা Prosodic।... দ্ব্যক্ষরিক, ত্র্যক্ষরিক, কি চতুরক্ষরিক শব্দেও নাসিক্যব্যঞ্জনধ্বনির অনুরণন তাদের পূর্ব ও পরে প্রসৃত হয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট অক্ষর এবং সমগ্র শব্দেরই সম্পদরূপে গণ্য হয়।"

ন-ধ্বনির ব্যঞ্জনা বিভিন্ন বিন্যাসে বিভিন্ন রকম হতে পারে। 'নাহি' পদের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি উক্তি প্রাসঙ্গিক বলে দেখতে পাই। তিনি লিখেছেন— ''টনটনানি যে যাতনা বুঝায়, উহা তীক্ষ্ণ যাতনা; অনুনাসিক ন-কার এই তীক্ষ্ণতা আনে।" আলোচ্য 'হি' ধ্বনিতে এই 'তীক্ষ্ণতা' সঞ্চার করেছে 'না' ধ্বনিটি। 'নাহি' উচ্চারণ পেয়েছে নিবিড় আন্তরিকতার।

এখন, নাসিক্যব্যঞ্জনা বিষয়ক চেতনার অভাবে গায়ক একটি কাব্যগীতির অন্তর্গত স্বরকে লঘু করে ফেলতে পারেন। যেমন এই চরণটি— ''আমার চোখের চেয়ে দেখা আমার কানের শোনা/ আমার হাতের নিপুণ সেবা আমার আনাগোনা"— এটিকে দু' ভাবে গেয়ে দেখানো যায়। এক ভাবে নাসিক্যব্যঞ্জনের প্রভাব ব্যবহার করে, অন্য ভাবে সংশ্লিষ্ট স্বরব্যঞ্জনে নাসিক্যব্যঞ্জনা বর্জন করে। শুনলেই বোঝা যাবে উচ্চারণের যে-আন্তরিকতা প্রথম গায়নে স্পষ্ট, দ্বিতীয় গায়নে তা অন্তর্হিত। দ্বিতীয় গায়নপদ্ধতি অস্বাভাবিকও বটে। মানবিক এবং শ্রোতার মর্মস্পর্শী করবার জন্য যে-কোন কথা কণ্ঠের পশ্চাদ্ভাগ থেকে উচ্চারণ

না করে নাকের bridge বা শিরদাঁড়া থেকে উচ্চারণ করতে বলেছেন পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞরা। নাসিক্যব্যঞ্জনা এড়াতে গিয়ে কণ্ঠের পিছন দিক থেকে উচ্চারণ করা হচ্ছে দ্বিতীয় গায়নে। যাঁরা এই কথাটি জানেন না, তাঁরা ঐ অমানবিক অস্বাভাবিক এবং নাসিক্যব্যঞ্জনা বিরহিত উৎকট উচ্চারণে গান গেয়ে কাব্য-গীতিকারের সৃষ্টির সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারেন। এমন গান মাঝে-মাঝে শোনা যায়, বাস্তবিক। পক্ষান্তরে, যথার্থ উচ্চারণকেই কেউ-কেউ অযথা সমালোচনা করে 'নাকি সুর' বলেন। অথচ, ভাষার স্বাভাবিক এবং সঙ্গত উচ্চারণে গানের বাণীকে ভাবগর্ভ করে বলবার এই সহজ শিক্ষাটুকু সঙ্গীতের পাঠদানকালে শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দেওয়া কিছুই নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে।

গানের প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত দুটি স্বরধ্বনি এবং দু' ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনির কথা আমরা আলোচনা করেছি। প্রতিটি স্বর আর ব্যঞ্জনের উচ্চারণস্থান এবং প্রক্রিয়া বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তুললে, সেই সঙ্গে ধ্বনির ব্যঞ্জনা বিষয়ে পাঠ দিতে পারলে সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ একটি ভিন্ন মাত্রা অর্জন করতে পারে। এ থেকে ব্যঞ্জনা বিকাশের উপযুক্ত শিক্ষা পাবে তারা।

বাঙালির উচ্চারণে রুদ্ধদলের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি প্রলম্বিত হবে— এ কথা নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং সুনীতিকুমারের মতো গুণী জ্ঞানীজন। এ দিকে লক্ষ রাখি না বলে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'আমার মল্লিকাবনে যখন প্রথম ধরেছে কলি' গাইতে গিয়ে 'ম'য়ের গায়ে-গায়ে হসন্তযুক্ত ল উচ্চারণ করে বসি! এ নিয়ে আক্ষেপ করেছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। ইদানীং রাগঘেঁষা বা আরবি-ফারসি শব্দ মেশানো বাংলা গানে এই উচ্চারণের ব্যতিক্রম, অর্থাৎ স্বরধ্বনি প্রলম্বিত না করে সঙ্গে-সঙ্গে পরবর্তী ব্যঞ্জন উচ্চারণও শোনা যায়, যা অস্বাভাবিক ঠেকে না। সে উচ্চারণের পরিস্থিতি অবশ্যই স্বতন্ত্র বিবেচনার বিষয়।

রেফ আর র-ফলার উচ্চারণে যে ভেদ আছে, তা স্পষ্ট না হলে সঙ্গীতের প্রার্থিত ধ্বনিরূপ বিকৃত হতে পারে। বজ্র, রাত্রি, রুদ্র, যাত্রী, পাত্র উচ্চারণে র-ফলার আগের ব্যঞ্জনটি দু' বার উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ বজ্‌জ্রো, রাত্‌ত্রি, রুদ্‌দ্রো, যাত্‌ত্রী, পাত্‌ত্রো। বজ্‌রো, রাত্‌রি, রুদ্‌রো, যাত্‌রা, পাত্‌রো উচ্চারণ অশুদ্ধ। কিন্তু এই রকম উচ্চারণে গাওয়া গান রেকর্ডেও শোনা যাচ্ছে এখন। অন্য পক্ষে সর্ব, সূর্য, আর্ত, স্বর্গ, মর্মর, বর্ণ উচ্চারণে পূর্ববর্ণ অর্থাৎ রেফ ধ্বনি সংক্ষিপ্ত হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ সর্‌ব্‌বো, আর্‌ত্‌তো স্বর্‌গ্‌গো, মর্‌ম্‌মর, বর্‌ন্‌নো। সর্‌বো, সূর্‌যো, আর্‌তো, স্বর্‌গো, মর্‌মর্‌, বর্‌নো উচ্চারণ অশুদ্ধ। কিন্তু এই অশুদ্ধি এখন দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। রবীন্দ্রনাথের ''প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কী দুর্দিন/ দারুণ ঘনঘটা অবিরল অশনি তর্জন" গানে শঙ্খ ঘোষ

রেফের উচ্চারণে যে-'পৌরুষ' শুনতে পেয়েছেন, তা ধূলিসাৎ হয়ে যায় 'গর্‌জনে' 'দুর্‌দিনো' 'তর্‌জনো' উচ্চারণে।

মানুষের ভাষাবৈশিষ্ট্যর সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুস্যূত হয়ে থাকে। যথাযথ ভাবে ভাষা উচ্চারণ করতে পারলে দেশিগান তথা কাব্যসঙ্গীতের বিশেষ চরিত্র গায়কের অধিগত হবার পথ তৈরি হয়, সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, সাংস্কৃতিক বোধ জাতিগত ভাবে এক জাতির সকল মানুষের ভিতর সুপ্ত থাকে— সে বোধকে জাগিয়ে তোলা দরকার। জাতীয় গীতস্রষ্টারা উন্নততর শক্তির অধিকারী হলেও একই সংস্কৃতির ধারক। তাই সচেতন পরিকল্পনায় গীতবাণীর ধ্বনিবিন্যাস না করলেও, তাঁদের বোধ ভিতরে-ভিতরে কাজ করে তাঁদের সৃষ্টিকে সার্থকতার তীর্থে উত্তীর্ণ করে। আমাদের সাধনা হবে তাঁদের শিল্পকে আত্মস্থ করে প্রচার করা। তাতেই সার্থক হবে গায়কের শ্রম এবং শিল্পীর সৃষ্টি।

গানের পাঠ আর উচ্চারণ-সমস্যা

কাব্যপাঠে কিংবা গানের বাণী উচ্চারণে কিছু হেরফের হলেই অর্থবোধের সমস্যা তো দেখা দেয়ই, আরও কিছু অসুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথের বাণীর মুদ্রণ-বিভ্রাট নিয়ে কানাই সামন্ত একটি দীর্ঘ আলোচনা লিখেছিলেন তাঁর *কবিভারতী* বইয়ের পরিশিষ্টে 'রবীন্দ্র রচনার পাঠ' নাম দিয়ে। মজার মজার সব খবর পাওয়া যায় তাতে। মুদ্রিত পাঠই তো আমাদের অবলম্বন, তাই পড়তে কিংবা উচ্চারণ করতে আরও যে কত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, কী বলব!

প্রথমে কানাই সামন্তের লেখা থেকে কয়েকটি গানের পাঠবিভ্রাটের কথা বলে নিই। *গীতবিতান* দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল মাঘ ১৩৪৮-এ। কিন্তু ছাপা শেষ হয়েছিল ভাদ্র ১৩৪৬-এই, রবীন্দ্রনাথের আপন তত্ত্বাবধানে। কানাই সামন্তের ভাষায় 'কবির সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধান' সত্ত্বেও 'শীতের বনে কোন্ সে কঠিন আসবে বলে' গানটির সঞ্চারী অংশে ছাপা হয়েছিল 'সইবে না সে পাতায় ঘাসে পাণ্ডুরতা/ তাই তো আপন রঙ ঘুচালো ঝুমকোলতা।' আরও বলছেন, দেখা গেল আষাঢ় ১৩৩৪-এ প্রকাশিত *নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা*-তে এবং মাঘ ১৩৩৪-এর 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ছাপানো স্বরলিপিতে পাঠ রয়েছে 'সইবে না সে পাতায় ঘাসে চঞ্চলতা/ তাই তো আপন রঙ ঘুচালো ঝুমকোলতা'। *গীতবিতান*-এর সেই পাঠ নিয়ে কানাই সামন্তর প্রশ্ন— ''গানের এই বাণীটুকু অর্থবহ হলো কি আমাদের কাছে? অসঙ্গত মনে হলো না?''

মনে পড়ে আমরাও ছেলেবেলায় ঐ গানে 'পাণ্ডুরতা' পেয়েছি। 'অসঙ্গত' মনে হয়নি কিন্তু। শীতের প্রতাপে চারদিকের মলিনতা, ঘাসে-পাতায় পাণ্ডুরতা দেখে ব্যথিত ঝুমকোলতাও নিজের রঙ ঘুচাল— এ ভাবনা অচল কি? তবু কবি নিজে যদি চৌত্রিশ সালে 'চঞ্চলতা' লিখে থাকেন তো কানাই সামন্তরা ভাবতেও পারেন— হ্যাঁ, ঐ পাঠই সঙ্গত ছিল। কিন্তু পরে যদি পরিবেশের দুঃসহ পাণ্ডুরতা

ঝুমকোলতার বিবর্ণ হবার কারণ মনে হয়ে থাকে কবির? পরের পাঠটা বেশি গ্রহণীয় কি না, সে-ও ভাবতে হবে। এ সব নানা ভাবনার জ্বালা আছে।

'কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে' গানটির আভোগ অংশে *গীতালি* (১৩২১) গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল 'বাতায়নের পাতা হতে যে ফুল দোলে।' ক্ষুব্ধ কানাই সামন্ত আরও জানিয়েছেন *রবীন্দ্র রচনাবলী*-র একাদশ খণ্ডেও (১৩৪৯) ঐ পাঠই ছাপা হয়েছে। ১৩২১-এর *প্রবাসী* পত্রিকায় এবং মূল পাণ্ডু-লিপিতে কিন্তু পাঠ রয়েছে 'বাতায়নের লতা হতে যে ফুল দোলে/ সে ফুল এ নয়।' ফুল অবশ্য লতা থেকেই দোলে, পাতা থেকে নয়, জানা মতে এক নাইটকুইনের ফুল ছাড়া। আর নাইটকুইন বাতায়নে বেয়ে উঠবার লতাও নয়। কাজেই 'পাতা' মুদ্রণপ্রমাদ থেকেই জন্মেছে, মনে করা যেতে পারে। এই ভুলটির বিষয়ে কানাই সামন্তর বক্তব্য— ''কৌতুকের কথা এই যে, কবির আয়ুষ্কালে তাঁর গ্রন্থে এ (অর্থাৎ শুদ্ধ) পাঠ তো কখনোই ছাপা হয়নি আর *প্রবাহিণী* (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) প্রকাশের প্রাক্‌কালে 'প্রবেশক' গীতগান অংশ যখন এটির সঙ্কলন করলেন কবি... মুদ্রিত ভুল পাঠই স্বহস্তে নকল করে বসলেন— বলা চলে, পূর্বতন মুদ্রণপ্রমাদকেই একটা মিথ্যা মর্যাদা দিলেন। আবার এও তো দেখেছি কোনো কোনো মুদ্রণপ্রমাদে বিভ্রান্ত হন নি কবি ওই লেখারই ইংরেজি রূপান্তর করতে গিয়ে। বাংলা বইয়ে তবু সংশোধন হয় নি কেন!''

ইংরেজি রূপান্তর করতে গিয়ে ভুল করতেন না রবীন্দ্রনাথ, এ একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বটে। কানাই সামন্ত তাঁর এই প্রবন্ধটিতে *গীতিমাল্য* কাব্যের 'আমি আমায় করব বড়ো এই তো আমার মায়া' ছত্রের শেষ সর্বনামের ভুলটি ইংরেজি অনুবাদ থেকে কেমন সংশোধন করা গেছে সে কথা লিখেছেন। ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*-তে রবীন্দ্র-অনুবাদে আছে, ''That I should make much of myself... costing coloured shadows on thy radiance such is thy maya.'' এ থেকে শুদ্ধ পাঠ পাওয়া যায়— ''আমি আমায় করব বড়ো এই তো তোমার মায়া।''

এ বার বলি 'তুমি রবে নীরবে' গানটির পাঠ নিয়ে কানাই সামন্তর সঙ্গে আমার মতভেদ আর নিরন্তর তর্কের কথা। আমি সেদিন রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদের সাক্ষ্য উপস্থিত করেও তাঁকে আমার সঙ্গে একমতে আনতে পারিনি। শান্তিনিকেতন থেকে দূরবাসী আমরা এ সব প্রসঙ্গ বিষয়ে অবহিত হবার সুযোগ বিশেষ পাই না। ঘটনাচক্রে জেনেছিলাম এখনকার *গীতবিতান*-এ ছাপা এ গানের ''মম দুঃখবেদন মম সফল স্বপন/ তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী সম'' অংশটি নিয়ে দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের কিছু তর্ক হয়েছিল।

গীতবিতান প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে ছাপা ছিল ''মম সকল স্বপন/ তুমি ভরিবে সৌরভে...।'' দেবব্রত রেকর্ডে সেই রকমই গেয়েছিলেন। মিউজিক বোর্ড বললেন, রেকর্ডে কথা ভুল হয়েছে। দেবব্রত জানালেন, তাঁর *গীতবিতান*-এ ছাপা বাণী এ রকমই। তাঁরা দ্বিতীয় সংস্করণ খুলে দেখালেন, তাতে আছে 'সফল স্বপন'। কলকাতাতে দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে এ বিতর্কের খবর শুনেছিলাম। দেবব্রত বিশ্বাস তখন মিউজিক বোর্ডের চশমা-আঁটা সদস্যদের সামনে কাতর পরীক্ষার্থী দেবব্রতর গান গাইবার ব্যঙ্গচিত্র আঁকছেন। সে ছবি দেখাতে-দেখাতেই পুরনো গল্প শোনাচ্ছিলেন আমাকে। সে ১৯৭৫-এর ডিসেম্বরের কথা বোধ হয়। তার অনেক দিন পরে শান্তিনিকেতনে একদিন আশ্রমকন্যা ক্ষমা ঘোষের *গীতবিতান*-এ দেখি 'সফল' কেটে 'সকল' লেখা রয়েছে। চমক লাগল। জিগ্যেশ করলাম, ''ক্ষমাদি, আপনার গীতবিতানে কে এই বদল করল?'' নরম স্বভাবের ক্ষমাদি হেসে বললেন, ''ওটা বিবিদির লেখা। গান শেখাতে গিয়ে বলেছিলেন 'সফল' হবে না, 'সকল' হবে। নিজে হাতে লিখে দিয়েছেন কেটে।'' বিবিদি হচ্ছেন রবীন্দ্র-স্নেহধন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। ক্ষমাদিকে তখন দেবব্রত বিশ্বাসের কাহিনী বললাম। পরে দেবব্রতকে 'সকল' বদলে 'সফল' গাইতে হয়েছিল কি না, সে আর মনে নেই আমার।

কথায় বলে, ''হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।'' রবীন্দ্রভবন যখন রয়েছে, তখন তর্ক-টর্ক না করে পাণ্ডুলিপি দেখে নিলেই হয় গিয়ে! গেলাম 'রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পে'র কানাই সামন্তের কাছে। এল পাণ্ডুলিপি। একটিতে কার হাতের লেখায় নকল করা 'সফল'। আর-একটিতে মনে হল কবির হাতের লেখাতেই 'সকল'-এর 'ক'-কে 'ফ' করা। কানাইবাবু বললেন, ''হুঁ! 'সফল' কবির হস্তলিপি তো!'' মন মানল না। গেলাম শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। চুপ করে সব কথা শুনলেন। মৃদুভাষী এই নীরব কর্মী আশ্চর্য রকমের স্মৃতিধর। অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, ''ওর একটা ইংরেজি অনুবাদ আছে যেন, দ্যাখো তো!'' বেরুল কবির নিজের করা অনুবাদে— ''All my dreams''। ছুটে গেলাম 'প্রকল্পে'র ঘরে। কানাইবাবুকে বললাম— এই দেখুন, এ তো 'সকল স্বপন'! উনি দেখলেন। কিন্তু বললেন, ''ঐ 'সফল স্বপন'ই চলে গেছে, যা-ই বল!''

শুনে, এ বার ক্ষুব্ধ হলাম আমি। এ কী কথা! প্রমাণ পেয়েও তা এ ভাবে অগ্রাহ্য করা যায় নাকি! রীতিমতো মুষড়ে পড়লাম। তাই ওঁর বইতে কবির নিজের ইংরেজি অনুবাদ থেকে সত্যসন্ধানের প্রসঙ্গ পড়ে আজ ভাবছি, তা হলে সেদিন কেন উনি ওরকম বলেছিলেন! 'সফল স্বপ্ন' তো আপন সৌরভে আপনি পূর্ণ! তাকে তো সৌরভে ভরে তুলবার অপেক্ষা থাকে না! জীবন-যৌবন এবং